The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 243-262, ISSN 2306-3920

পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭০): বাঙালি নারী

আসমা উল হুসনা*

সার-সংক্ষেপ: পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে পরিচালিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বাঙালি নারীর তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল। বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো এ সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক আত্ম-পরিচয়ের মূল সূত্রটি বিকশিত হতে থাকে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক আন্দোলন যত জোরদার হয়েছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন তার সঙ্গে পথ চলেছে সমান তালে। এ সময় কেবল প্রকাশ্য রাজপথে আন্দোলন ছাড়াও শিল্প সংস্কৃতির জনপ্রিয় মাধ্যম সঙ্গীত, নাটক, কবিতা, নৃত্য, চলচ্চিত্র প্রমুখ প্রতিবাদী অস্ত্রে পরিণত হয়। ফলে বহুমাত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়। এ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একদিকে নারীরা যেমন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পায় অন্যদিকে তাদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতাও বৃদ্ধি পায়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ধর্মীয় ও সামাজিক নানা প্রথার মধ্য দিয়ে বাঙালি নারীদের যখন গৃহে আবদ্ধ রেখে শুধু পারিবারিক দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা হয় তখন নারীদের এ সাহসী অংশগ্রহণ বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে।

ভূমিকা: পূর্ব বাংলায় (১৯৪৭-১৯৭০) সময়কালে পরিচালিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সাংস্কৃতিক কর্মী, সংগঠক ও শিল্পী হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসময় রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে এবং তাকে এগিয়ে নিতে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক। সাংস্কৃতিক কর্মীরা বাঙালি সংস্কৃতির বহুমুখি চর্চার মাধ্যমে প্রধানত এগিয়ে নিয়েছিল এ আন্দোলন যার উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল নারী। ফলে নারীদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার পরিধিও বৃদ্ধি পায় বহুগুণ। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নানা প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে নারীরা এ ঐতিহাসিক গুরু দায়িত্ব পালন করে। যদিও ইতিহাসে পুরুষদের ভূমিকা ও অবদানই বেশি আলোচিত ও স্বীকৃত হয়েছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীদের বহুমাত্রিক কার্যক্রম সত্ত্বেও তা অনেকাংশে যেমন অনালোচিত রয়ে গেছে আবার কোথাও কোথাও উপেক্ষিত হয়েছে। তাই কার্যক্রমের বহুমাত্রিকতা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে আলোচ্য বিষয়টি বেছে নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট গবেষণা প্রশ্নটি হলো, 'পূর্ব বাংলায় ১৯৪৭-১৯৭০ কালপর্বে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বাঙালি নারীর অংশগ্রহণের স্বরূপ ও ভূমিকা কি ছিল তা নির্ণয় করা'।

বর্তমান প্রবন্ধটি চারটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আলোচনা করা হয়েছে সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংজ্ঞা সম্পর্কে। দ্বিতীয় ভাগে আছে বাঙালি নারীর সংস্কৃতি চর্চা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ধরণ। তৃতীয় ভাগে প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর

* **আসমা উল হুসনা** : সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

অংশগ্রহণের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ ভাগে আলোচনা করা হয়েছে আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের নানা প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে।

১.সংস্কৃতি ও পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন:

ধারণায়ন: পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ শীর্ষক বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক চেতনা ও আন্দোলন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন। যা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

সংস্কৃতি: সংস্কৃতি এর গঠন, উপাদান ও পরিবর্তন সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদদের মাঝে রয়েছে নানা বিতর্ক। এর সর্বজন গৃহীত সংজ্ঞা নির্ণয় কঠিন। Alfred Kroeber এবং Clyde Kluckhohn রচিত Culture: A Critical Review of Concepts and Definition(1952), New york গ্রন্থটি সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ণয় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। গ্রন্থটিতে ১৬৪টি সংজ্ঞা বিভিন্ন গ্রুপ ও সাব গ্রুপে বিভক্ত করে এ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে সংস্কৃতির বর্ণনামূলক সংজ্ঞায় বলা হয়, 'Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society'. (E.B. Tylor, Primitive Culture, 1871, Boston)

ঐতিহাসিক সংজ্ঞায় দেখা যায় '… the culture that which we inherit by social contact…' (A. Tozzer, social origins and social continuities, New York, 1925, P-6.)

আদর্শিক সংজ্ঞায় বলেন 'The culture of a society is the way of life of its members, the collection of ideas and habits which they learn, share and transmit from generation to generation'.(R. Linton, the cultural background of personality, 1945, New York, P-203.)

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সংস্কৃতি সম্পর্কে বলা হয়, 'A culture is a common way of life, a particular adjustment of man to his natural surroundings and his economic needs'. (C. Dawson, the age of the Gods, A study in the origins of culture in prehistoric Europe and the Ancient East, 1928, London.)

কাঠামোগত সংজ্ঞায় দেখা যায় 'Culture is the name given to the abstracted [from men] intercorrelated customs of a social group'.(J.Dolland, Culture, Society, Impulse and Socialization, American journal of sociology vol-45,p-50-63.)

উক্ত গ্রন্থে কিছু অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা আছে। যেখানে বলা হয়, 'culture may be defined as what a society does and thinks'.

অপর নৃতত্ত্ববিদ Ruth Benedict, এর Pattern of Culture (1934) New York সংস্কৃতি বিষয়ক বিতর্কের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে তিনি শুধুমাত্র আচার-আচরণ নয়, অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ বিশ্লেষণে সংস্কৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রতিটি সমাজে যে সাংস্কৃতিক নিদর্শন গুলো বিকশিত হয়, তার মতে তা অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা সঠিক মনোভাবকে নির্দেশ করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলতে পারি, সংস্কৃতি হলো একটি জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ এবং সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপনের সামগ্রিক রূপ। মানুষের বেঁচে থাকা, তার সমাজ চেতনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ অর্থাৎ তার সামগ্রিক জীবন প্রতিফলিত হয় সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি মানুষ অন্য সকল মানুষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। যা একটি জাতি গঠনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। আবুল কাশেম ফজলুল হকের মতে, 'একটি ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশে যুগ পরম্পরায় মানুষ তার সংস্কৃতি অর্জন ও লালন করে। সংস্কৃতি চর্চা জীবন চর্চারই বিকল্প রূপ'(হক, ২০০২:২৭)। এ কারণে সংস্কৃতি চর্চা শুধুমাত্র বিনোদন বা মনোরঞ্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এর প্রধান ভূমিকা হলো মানুষের জীবন

সংগ্রামের সহায়ক হওয়া। আর সুস্থ সংস্কৃতি বিভিন্ন সংকটে মানুষের প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হয়ে সমাজকে বদলে দিতে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন: সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলতে বোঝায় উন্নত জীবন পদ্ধতি, সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনগণের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আন্দোলন (সিদ্দিকী, ১৯৯৬:২১)। বদরুদ্দীন উমর সুস্থ সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের আন্দোলনকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে, 'শুধু তাই নয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ব্যতিত সুস্থ রাজনৈতিক আন্দোলন সম্ভব নয়'(উমর,২০০৩:৭১)। অর্থাৎ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেখানে সমাজ পরিবর্তনের অধ্যায় রচিত হয় সেখানে সাংস্কৃতিক আন্দোলন অনিবার্য। এর কাজ হলো রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ পরিষ্কার করা।

বাঙালির জীবনে যখনই ক্রান্তিকাল দেখা দিয়েছে তখনই সে তার প্রতিবাদ, সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রগুলোকে বেছে নিয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বাস্তবতায় দেখা যায় যে, নৃতত্ত্ব, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভিন্নতা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। নবগঠিত রাষ্ট্রে তাদের প্রত্যাশা ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান করা। কিন্তু কিছু দিনের মাঝেই পূর্ব বাংলার জনগণ আশাহত হয়। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ পরিকল্পিতভাবে পুর্ব বাংলার ওপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে শোষণ শুরু করে। প্রথম আঘাত আসে পূর্ব বাংলার ভাষা তথা সংস্কৃতির ওপর যা আরও প্রকট হয় সামরিক শামনামলে। এ সময় ধর্মভিত্তিক সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার প্রচেষ্টা শুরু করে সরকার। এ সময় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো বাংলা হরফের পরিবর্তে আরবি ও রোমান হরফ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্র, রবীন্দ্রবিরোধিতা, নজরুল সাহিত্য বিকৃতি এবং প্রগতিশীল শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও তাঁদের সংগঠনগুলোর কাজে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এর পেছনে মূল অভিসন্ধি ছিল অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক আধিপত্যবাদ বজায় রাখা। সাহিত্যসেবী ও চিন্তাবিদ আব্দুল হক লিখেছেন, 'পাকিস্তান আমলে এদেশে সংস্কৃতি চর্চার স্বাধীনতা ছিল না। ঐ সময় ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং আরও অনেক ব্যাপারে চোখ লাল করে বলা হতো এইটা করবেন না এবং এইটা করেন' (হক, ১৯৯৮:৬০)। বাঙালি সংস্কৃতির ওপর এ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র শক্তির সঙ্গে শুরু হয় বাঙালির সাংস্কৃতিক সংঘাত। ফলে পুরো পাকিস্তান সময়কালে (১৯৪৭-৭০) বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার প্রেক্ষিতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক এ আন্দোলনের পাশাপাশি সমান্তরাল গতিতে এগিয়ে চলে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এসময় রাজপথে যেমন আন্দোলন হয়েছে তেমনি সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়েও প্রতিবাদ করা হয়েছে। গান, কবিতা, নাটক, কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদি হয়ে উঠে প্রতিবাদের অস্ত্র। ফলে সাংস্কৃতিক কর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীর মাঝে পার্থক্য লোপ পায়। এ প্রসঙ্গে মফিদুল হক (ট্রাস্টি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর) বলেন, 'যারা সাংস্কৃতিক কর্মী তারা সাংস্কৃতিক সংগঠকও ছিলেন, তারা আবার রাজনৈতিক কর্মীও। যারা সাংস্কৃতিক কাজ করেছে তারা রাজনীতিটাকেও সমর্থন করেছে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডটাই তখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল।সাংস্কৃতিক কর্মী তখন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই তার রাজনৈতিক স্টেটমেন্ট দিয়েছে, রাজনীতিকে আরও পরিপুষ্ট করেছে। দুটোই ছিলো পরস্পরের পরিপূরক' (সালাম, ২০১৮:২১৬)। এ বক্তব্যের সমর্থনে মাহফুজা খানম বলেন, রাজনীতি যারা করেছে তারাইতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজে অংশ নিয়েছে (সাক্ষাৎকার-২০১৯, ১লা সেপ্টেম্বর)। অর্থাৎ এ সময় জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণ ও সাংস্কৃতিক স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলে সমান্তরাল গতিতে এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনার আলোকে সংস্কৃতি যুক্ত হয় বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে। এ প্রসঙ্গে সাঈদ-উর-রহমান বলেন, 'রাষ্ট্রভাষা

আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন একীভূত হয়ে পড়ে। সে সময় রাজনীতি ও সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে বিচ্ছিন্নতা ঘটেনি হয়তো বিচ্ছিন্নতা ঘটে না কখনও (রহমান, ২০০১:১৪)।

২. পূর্ব বাংলার নারী জাগরণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ:

বাঙালি নারীদের মাঝে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ইতিহাস পুরাতন হলেও দেশভাগ পরবর্তী সময় বাঙালি মুসলিম নারীদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ছিল খুবই সীমিত। এ সময় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মুসলিম নারীদের তুলনায় হিন্দু নারীরা ছিল বেশি অগ্রগামী। কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও পরবর্তী বিভিন্ন সময় সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠী পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে। তাদের মাঝে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর অনেক হিন্দু নারী তাদের পরিবারের সঙ্গে দেশ ত্যাগ করে। ফলে পূর্ব বাংলায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে একটি সাময়িক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কারণ তখনও পূর্ব বাংলায় মুসলমান সমাজে পর্দা প্রথা ছিল প্রকট। ঘোড়ার গাড়িতে পর্দা টানিয়ে মুসলমান নারীরা চলাফেরা করতেন। হেঁটে চললে বোরখা পরতেন। বেতারে যে দু'একজন গান গাইতেন,তাঁরাও বেতার কেন্দ্রে যেতেন পর্দাঘেরা গাড়িতে,গান গাইতেন পর্দার আড়াল থেকে (সালাহউদ্দিন,২০০৬:১৪)। অভিনয় শিল্পী শর্মিলি আহমেদ বলেন, 'পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ঢাকা রেডিওতে তেমন কোন মুসলিম নারী কণ্ঠ শিল্পী ছিলেন না। রক্ষণশীল সমাজের প্রচণ্ড বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে মুসলিম নারীরা এ পথে খুব কমই অগ্রসর হতেন'(সাক্ষাৎকার-২০২২,১লা জানুয়ারি)। মঞ্চে নারীদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন পুরুষ শিল্পী আর নারীদের নাটকে নারীরাই সাজতেন পুরুষ নট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন থিয়েটার ও নাট্য সংগঠনগুলোর মঞ্চায়িত নাটকে নারী শিল্পীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে নাট্যকার রামেন্দ্র মজুমদার বলেন, পঞ্চাশের দশকে সহ অভিনয় তেমনভাবে চালু না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী নাট্যকর্মীর অভাব দেখা যায়। নারী শিল্পী বাইরে থেকে আনা হতো। আধা পেশাদার শিল্পী ছিল তখন যা ছিল তাদের পার্ট টাইম পেশা (সাক্ষাৎকার- ২০১৯,৫জুলাই)। তবে পঞ্চাশ পরবর্তী ষাটের দশকে এসে নারী প্রগতির ধারায় গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। পর্দা প্রথা অনেকাংশেই লোপ পায়। নারীর প্রতি পুরাতন মূল্যবোধ ক্ষীণতর হতে থাকে। ফলে সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্র যেমন- নাটক, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শিল্পীর আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় যা নিয়ে তেমন কোন সামাজিক সংকটও তৈরি হয়নি। এর অন্যতম কারণ ছিল পূর্ব বাংলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ যারা নারীদের সম্পর্কে রক্ষণশীলতা পরিহার করে উদার মনোভাব পোষণ করেছে।

এ সময় পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত হয়। ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময় পাকিস্তান জাতীয়তাবাদী ধারার স্থলে বাংলায় স্বতন্ত্র্য বাঙালি সংস্কৃতির ধারা জনপ্রিয় হয়। আবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর বিভিন্ন সময় শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নানা বিধি নিষেধ আরোপের ফলে সংস্কৃতি হয়ে ওঠে রাজনৈতিক প্রতিবাদের ভাষা। সমাজের ভেতর এ মৌলিক পরিবর্তন সংস্কৃতি চর্চাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বিনোদনের মাধ্যম ছাড়াও সংস্কৃতি চর্চা এ সময় প্রতিবাদের অস্ত্রে পরিণত হয়। ফলে নারীদের সংস্কৃতি চর্চার পরিধি এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুযোগও বৃদ্ধি পায়। তবে অংশগ্রহণকারী নারীদের সংখ্যা ও কার্যক্রমের বৈচিত্র্যতা বিচারে আলোচ্য প্রবন্ধে নিম্নোক্ত আন্দোলনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে-

৩. (ক) ভাষা আন্দোলন ও নারীর অংশগ্রহণ:

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণের বিষয়টি ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথম ফুটে ওঠে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক

আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন মূলত দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় যখন ভাষার দাবি কেবল পত্র-পত্রিকায় লেখনি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের দাবি ও তাদের কার্যক্রমের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়, ভাষার দাবিতে রাজপথে আন্দোলন হয়। উভয় পর্যায়ই নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

ভাষার দাবিতে রাজপথে নামার পূর্বে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন অর্থাৎ পত্র-পত্রিকায় নারীদের বিভিন্ন লেখনি ভাষা প্রশ্নে শুরু থেকে তাদের সচেতনতাই প্রমান করে। যদিও ইতিহাসে পুরুষদের লেখনীই আলোচিত হয়েছে। নারীরা থেকেছে উপেক্ষিত। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষার পক্ষে যৌক্তিকতা তুলে ধরে *স্বাধীনতা* পত্রিকায় সম্পাদক বরাবর আয়েশা বেগম একটি চিঠি লেখেন। এখানে তিনি বলেন,

> একটা কথা উঠেছে, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নাকি হবে উর্দু। বাংলা ও আসামের যে যে অংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়েছে তার চার কোটি অধিবাসীদের মধ্যে বাংলা যারা বলে না কিংবা বাংলা মাতৃভাষা নয় তেমন লোকের সংখ্যা হাজারে একজনেরও কম। যেখানে প্রায় সকল অধিবাসীরই মাতৃভাষা বাংলা, সেখানে একটা স্বতন্ত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করে ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে জনগণকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। যেমন করেছিল আমাদের ইংরেজ প্রভুরা। ... কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে বিদেশী রাজত্বের সাদৃশ্য কি থাকতে পারে? পাকিস্তান হবে জনগণের রাষ্ট্র দেশের সম্পদ যেখানে ব্যবহৃত হবে জনগণের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কাজে। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের লোকের মাতৃভাষার পরিবর্তে একটি স্বতন্ত্র ভাষার স্বপক্ষে যুক্তি কোথায়? (বিশ্বাস,১৯৯৫)

উল্লেখ্য যে চল্লিশের দশকের শুরুতে সাহিত্যিকরা ভাষা বিষয়ে বিতর্কে জড়ান। সমকালীন সংবাদপত্রে যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সংবাদপত্রগুলো পক্ষে-বিপক্ষে নানা প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশ করে ভাষার বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এসময় লেখক-সাংবাদিক আবদুল হক, মাহবুব জামাল জাহেদী, ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড.এনামুল হকের ভাষা বিষয়ক লেখনী উল্লেখযোগ্য। আয়েশা বেগমের এ চিঠি সে প্রচেষ্টারই অংশ। বিভাগ পরবর্তী সময়ও নারীদের এ লেখনী প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এ সময় *বেগম* পত্রিকায় নারীরা রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে তাদের মনোভাব প্রকাশ করে ভাষার দাবিকে জোরালো করে। ১৯৪৭ সালে *বেগম* পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়,

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তা লইয়া বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা, কেহ বলিতেছেন উর্দু আবার কেহ ইংরেজির কথাও বলিতেছেন। ... সমগ্র পাকিস্তানের তিনভাগের প্রায় দুইভাগ অধিবাসী পূর্ব পাকিস্তানে বাস করে এবং ইহাদের সকলেরই মাতৃভাষা বাংলা। ... সেহেতু রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী সর্বাপেক্ষা প্রবল বাংলা ভাষার। ... আমাদের নারী সমাজ সাহিত্যের দিক দিয়া অত্যন্ত পশ্চাদপদ। উর্দু রাষ্ট্র ভাষা হইলে তাঁরা আরও পশ্চাদপদ হইয়া যাইবেন। অতএব পূর্ব পাকিস্তানে যাতে 'বাংলা' রাষ্ট্র ভাষারূপে গৃহীত হয় সেজন্য আমাদের নারী সমাজ সর্বত্র আন্দোলন করিবেন আশা করি। এ বিষয়ে পাকিস্তান গণপরিষদস্থ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের বিশেষতঃমহিলা প্রতিনিধির গুরু কর্তব্য রহিয়াছে। (*সাপ্তাহিক বেগম*, ২৭ জুলাই, ১৯৪৭, বেগম, ২০০৬:৭৩)

মোহসেনা ইসলাম 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামে *বেগম* পত্রিকায় প্রকাশিত অপর এক প্রবন্ধে বলেন যে,

> ... পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণের ভাষা হচ্ছে বাংলা। বাংলা ভাষা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রাণের ভাষা। যে ভাষায় মুসলমানরা বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে তাদের জীবনের সুখ-দু:খ, হাসি-কান্না আর আনন্দ-বেদনা সাহিত্যের মারফত প্রকাশ করে

> এসেছে। আলাউল, দৌলত কাজি থেকে শুরু করে আধুনিক নজরুল, ফররুখ পর্যন্ত সকলেই বাংলা ভাষার ভেতর দিয়ে সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। এক কথায়, এদেশের মুসলিম সমাজের কৃষ্টি, সভ্যতা আর তাহ্জীব-তমদ্দুনের পূর্ণতর বিকাশ বাংলা ভাষার মারফত। বাংলা তাদের নিজস্ব প্রাণের ভাষা। বিশ্বের দরবারে আজ বাংলা সাহিত্য এক শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন। ... (*সাপ্তাহিক বেগম*, ২৩ আগস্ট ১৯৪৭, বেগম, ২০০৬:৭৪)

পূর্ব বাংলার নারী সমাজের অনগ্রসরতা দূরীকরণে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতায় তিনি আরও বলেন,

> ... পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজ এমনিই শিক্ষায় অনেকটা অনগ্রসর। তদুপরি উর্দু ভাষার সাথে তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। যদি এই হয় তবে বিগত বহু দিনের সাধনায় বাংলায় মুসলিম নারীরা সাহিত্য এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে যতদূর অগ্রসর হয়েছিল তাও আবার পেছনে পড়তে বাধ্য হবে। পাকিস্তান সরকার যেন উর্দুর মত অপরিচিত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ না করেন এজন্য নারী সমাজের পক্ষ থেকে আমরা অনমনীয় দাবি জানাচ্ছি। (*সাপ্তাহিক বেগম*, ২৩ আগস্ট ১৯৪৭, বেগম, ২০০৬:৭৩)

ভাষার দাবিতে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়, বিবৃতি এবং চিঠিপত্র লেখা ছাড়াও স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে নারীরা তাদের মতামত তুলে ধরেন যা ভাষার প্রশ্নে তাদের সচেতনতাই প্রমাণ করে। সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, গ্রন্থ প্রকাশক, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর নিকট যে স্মারকলিপি প্রদান করে তাতে অন্যান্যদের সাথে স্বাক্ষর করেন মিসেস লীলা রায় এম.এ. (সম্পাদিকা, *জয়ন্তী*), মিসেস আনোয়ারা চৌধুরী বি.এ.বি.টি. সেক্রেটারি নিখিল চন্দ মোসলেম মহিলা সমিতি (*সাপ্তাহিক বেগম*,২১ নভেম্বর,১৯৪৭, বেগম,২০০৬:৭৫)।

১৯৪৭ পরবর্তী সময় ভাষার দাবি যখন জোরালো হয় এবং একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয় তখন নারীরা ভাষার দাবিতে মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ, সাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ, চাঁদা তোলা বা অর্থ সংগ্রহ করা, মিটিং-মিছিলে বক্তৃতা করা, পোস্টার লেখা ও পোস্টার লাগানো, মিটিং মিছিলের জন্য প্রচারণা ও তা সংগঠিত করা, লিফলেট লেখা ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িত থেকেছেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মানি অর্ডার, ডাকটিকিট এবং টাকার মাঝে বাংলার পরিবর্তে উর্দু এবং ইংরেজি ব্যবহার করা হলে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত ও সচেতন মহল শংকিত হয়ে উঠেন এবং তাদের মাঝে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের আগস্টে বাংলা ভাষার দাবিকে জোরালো করতে অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে গঠিত হয় তমদ্দুন মজলিশ। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজির সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন(উমর,১৯৯৫:৫৩)। কিন্তু এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করা হয়। এর প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, বিভিন্ন ছাত্রাবাস এবং তমদ্দুন মজলিশের যৌথ উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় উপস্থিত নারী সদস্যদের মাঝে ছিলেন আনোয়ারা খাতুন ও লিলি খান (কবির,২০১৪:১০৩)। এছাড়া ১৯৪৮ সালে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন লিলি খান এবং মিসেস আনোয়ারা খাতুন।

বিভিন্ন সময় নারীরা যে প্রতিবাদ ও স্মারকলিপি পেশ করে তা সমকালীন পুরুষদের কাছেও প্রশংসিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ই জানুয়ারি পাকিস্তান সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুর রব সিলেট

সফরে গেলে একটি মহিলা প্রতিনিধি দল জোবেদা খানম চৌধুরীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এবং আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশন মন্ত্রীর সাথে দেখা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। উক্ত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন বেগম জোবেদা খানম চৌধুরী (সভাপতি), সৈয়দা সাহারা বানু চৌধুরী (সহ-সভাপতি), সৈয়দা লুৎফুন্নেছা বেগম (সম্পাদিকা), সৈয়দা নজিবুন্নেসা বেগম (সিনিয়র সদস্য) এবং সিলেট সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী রাবেয়া খাতুন। এ স্মারকলিপি পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে পাঠানো হয় (উমর,১৯৯৫:৪৫-৪৬)। এমনকি ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষার প্রস্তাব করলে সিলেট মুসলিম মহিলা লীগ তাঁকে সমর্থন জানিয়ে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন (কবির,২০১৪:১২৮)। এ সময় ঢাকায় বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে সাধারণ নারীরা ভাষার দাবিতে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

প্রথম দিকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান, স্মারকলিপি পেশ প্রমুখ ক্ষেত্রে ভাষার দাবি সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গন থেকেও ভাষা বিষয়ে সোচ্চার দাবি ওঠে। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি সংসদ ভাষা বিষয়ে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবীকে জোরদার করতে ১৯৫১ সালের ১৬-১৮ মার্চ চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক পরিষদ ও প্রান্তিক নামক সাংস্কৃতিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এখানে চট্টগ্রামের প্রায় ১০০ নারীর অংশগ্রহণ ছিল (সিদ্দিকী,১৯৯৬:১৮১)। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বেগম সুফিয়া কামাল। চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে কতগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেখানে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি ছিল অন্যতম (উমর, ১৯৮২)।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভাষার দাবিতে নারীরা রাজপথে জোরালো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এ আন্দোলনে বিভিন্ন বয়সের নারীদের অংশগ্রহণ থাকলেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে ছাত্রীরা। যদিও সামাজিক পশ্চাৎপদতার কারণে নারীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ তেমন সহজ ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ একত্রে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১০০ এর কম। ছেলেদের মেয়েদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা নিষেধ ছিল। প্রয়োজন হলে প্রক্টরের মাধ্যমে কথা বলতে হতো নতুবা ১টাকা জরিমানার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষক ক্লাসে যাওয়ার সময় ছাত্রীদের কমনরুম থেকে ডেকে নিয়ে যেতেন (সাক্ষাৎকার-২০১৯, ১লা সেপ্টেম্বর)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অবস্থা যদি এই হয় তা হলে অন্যান্য শহর ও মফস্বলের নারীদের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে এ ধরণের পরিস্থিতির মাঝেও ছাত্রীরা সামাজিক বাধা বিপত্তি ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বহিষ্কার অথবা অভিভাবকগণ কর্তৃক পড়ালেখা বন্ধ করার ভয় প্রমুখ উপেক্ষা করে আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীন কর্তৃক পল্টন ময়দানে জিন্নাহর ঘোষণার পুনরাবৃত্তি হলে (উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা) ছাত্র-ছাত্রী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে ঢাকা বার লাইব্রেরীতে একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করা হয়। এ সভায় নারীদের মাঝে বক্তৃতা করেন ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহবুবা খাতুন। তিনি বলেন যে, 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি স্বীকার করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েরা তাদের রক্ত বিসর্জন দিবে'(উমর,১৯৯৫:১০০)। আন্দোলনের শুরুতে একজন ছাত্রীর মুখে এমন সাহসী উচ্চারণ ভাষা বিষয়ে সকলের মনে উদ্দীপনা যোগাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় যার অন্যতম সদস্য ছিলেন পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের সদস্য মিসেস আনোয়ারা খাতুন (আহাদ,২০০৪:১৩১)।

১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভা এবং সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ধর্মঘটকে

সফল করতে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে ছাত্রীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। ছাত্রীদের মাঝে লায়লা সামাদ, শামসুন নাহার, শাফিয়া খাতুন, সারা তৈফুর, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহীম, রওশন আরা রহমান, হালিমা খাতুন, কায়সার সিদ্দিকী ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন বক্‌শী বাজার কলেজ বা বদরুন্নেসা কলেজ, মুসলিম গার্লস স্কুল, বাংলা বাজার গার্লস স্কুল, কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল ঘুরে ছাত্রীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাদের সাথে ইডেন কলেজের ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রীদের সংগঠিত করার ব্যাপারে সারা তৈফুর এক স্মৃতিচারণে বলেন,

> ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালেও আমরা দুই তিনজন মুসলিম গার্লস স্কুলে যাই। এসেম্বলীতে মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলি, ভাষা আন্দোলনের কথা তোমরা জান। ... আজকে একটা মিটিং হচ্ছে আমতলায়। তোমরা যারা যেতে চাও আসতে পারো। আমাদের বক্তব্য শুনে ওদের প্রায় ২৫/৩০ জন আমাদের সাথে আসে। (আব্দুল্লাহ, ১৯৯৭:১৭-১৮)

২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে এক সভা শুরু হয়। সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে-বিপক্ষে বক্তৃতার পর গাজীউল হক ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার পর ছাত্রদের দু'তিনটি দল বাইরে বের হয়ে যাওয়ার পর পরই সুফিয়া ইব্রাহিম, শাফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন্নাহার, সারা তৈফুর প্রমুখ ছাত্রীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় বের হন (কবির, ২০১৪:১০৬)। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার মূল কাজটি রওশন আরা বাচ্চু সহ আরও কয়েকজন ছাত্রীর দ্বারাই সংঘঠিত হয়। এ সময় পুলিশের লাঠি চার্জ ও টিয়ারশেলে অনেক ছাত্রী আহত হন। তাদের মাঝে রওশন আরা বাচ্চু, সারা তৈফুর, বেগম শামসুন, সুফিয়া ইব্রাহীম, সুরাইয়া ডলি, সুরাইয়া হাকিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন (খান, ২০১৬: *দৈনিক সমকাল*,)। সেদিন বর্তমান জগন্নাথ হলে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের এসেম্বলি চলছিল। এখানে আইন পরিষদের সদস্য আনোয়ারা খাতুন প্রতিবাদী বক্তব্য দিয়ে বলেন, 'মিস্টার স্পিকার পুলিশের লাঠিচার্জে মেয়েরা আহত হয়েছে। ... মেয়েদের মোট আহতের সংখ্যা ৮ জন। মন্ত্রীসভা এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন যাতে নাকি মেয়েরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছে' (রহমান, ২০১২:৯১)।

২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণের পর নারীরা বিভিন্ন স্থানে সভা করে এর প্রতিবাদ জানায়। ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইউনিয়নের সহ-সভাপতি শফিয়া খাতুনের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নিরস্ত্র ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের উপর সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ ও নিন্দা এবং সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয় (*দৈনিক আজাদ*, ২৪.২.১৯৫২)। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার ১২নং অভয় দাস লেনে ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনার প্রতিবাদে নারীদের এক বৃহৎ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিশোরী থেকে বৃদ্ধ সকল বয়সের নারীরা সভায় যোগদান করেন। সভায় বিভিন্ন দাবির মাঝে অন্যতম ছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তিদান (*দৈনিক আজাদ*, ২৭.২.১৯৫২)।

আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে অর্থের প্রয়োজনে রাস্তায় নামেন ছাত্রীরা। এ প্রসঙ্গে আব্দুল মতিন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক) বলেন,

> আন্দোলন দেশময় ছড়িয়ে দেবার জন্য টাকার খুবই প্রয়োজন ছিল। এ সময় চামেলী হাউসের ছাত্রীদের কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জানাই। ওরা কয়েকজন কলোনিতে যায় এবং আশাতীত সাড়া পায়। প্রায় দশ হাজার টাকা ওরা সংগ্রহ করে আনে। (মতিন ও আহমেদ, ১৯৯১:১৮৩)।

আন্দোলনের প্রতি সাধারণ নারীদের সহানুভূতি এত প্রবল ছিল যে, আন্দোলনের খরচ চালানোর জন্য এক গৃহবধূ তার অলঙ্কার খুলে দেয় শহীদ মিনারের পাদদেশে। এ সম্পর্কে ভাষা সৈনিক প্রফেসর ড. শরিফা খাতুন বলেন,

> সেদিন নিজের গহনা শহীদ মিনারের পাদদেশে অর্পন করেন বর্তমান বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এর মা। আমরা গিয়েও সেখানে গয়না পড়ে থাকতে দেখেছি। এগুলো আহতদের চিকিৎসা ও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য দেয়া হয়। অনেক ছাত্রী টাকাও দিয়েছিল। ইডেন কলেজে আমরা একদিন রান্না করে গ্রেপ্তার হওয়া ভাইদের জন্য জেলাখানায় খাবার পাঠিয়েছি। (সাক্ষাৎকার- ২০১৪, ২৫ মার্চ, খান: ২০১৮)

সরাসরি আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছাড়াও নানা পেশা ও বয়সের নারীরা আন্দোলনে বিভিন্নভাবে একাত্মতা প্রকাশ করেন। তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাশেমের স্ত্রী রাহেলা বেগম, বোন রহিমা এবং রাহেলার ভাইয়ের স্ত্রী রোকেয়া আন্দোলনকারীদের দীর্ঘদিন রান্না করে খাইয়েছেন তাদের আজিমপুরের বাসায়। আহতদের চিকিৎসায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা। পুলিশের তাড়া খাওয়া ছাত্রদের নিজ বাসায় লুকাতে সহায়তা করেন গৃহবধূরা। এভাবে নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বয়সের নারীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে কিশোরীদের ভূমিকাও ছিল অনবদ্য। সে সময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। কারাগারে থাকাকালীন কিছু ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করে তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন,

> আমাদের এক জায়গায় রাখা হয়েছিলো, জেলের ভেতর যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিলো তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল, যে পাঁচদিন আমরা জেলে ছিলাম, সকাল ১০ টায় স্কুলের মেয়েরা ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করতো, আর চারটায় শেষ করতো, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না', নানা ধরণের শ্লোগান। (রহমান, ২০১২:৯৩-৯৪)

ভাষা আন্দোলন কেবল ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন বয়সের নারীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রামে আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে ভাষা সৈনিক মাহবুবুল আলম চৌধুরী বলেন,

> মিরা সেন, জাহানারা রহমান, রওশন আরা রহমান, হোসনে আরা মাক্ষী এরা চট্টগ্রামে পোস্টার লিখত এবং লাগাত। মেয়েরা বিভিন্ন স্থানে চাঁদা তুলেছে এবং মাইকের পরিবর্তে চোঙ্গা হাতে ভাষার দাবী প্রচার করেছে। (সাক্ষাৎকার-২০০৫, ২৫মে, কবির, ২০১৪:১৩৬)

চট্টগ্রামের ন্যায় রাজশাহীতেও আন্দোলনের প্রচারণায় নারীদের সাহসি ভূমিকা ছিল। তারা আন্দোলনের প্রচারণায়, চাঁদা সংগ্রহে যুক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভাষা সংগ্রামী গোলাম আরিফ টিপু বলেন,

> রাজশাহীতে মাইকে টমটম গাড়িতে প্রচারণা চালানো হয়। অনেক সময় মাইকের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় চোঙ্গা। এ প্রচারণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন মোহসেনা ও জেরিনা। (সাক্ষাৎকার-২০০৫, ১২ সেপ্টেম্বর, কবির, ২০১৪:১৩৬)

ঢাকার বাইরে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সব থেকে বেশি চাঙ্গা হয়েছিল নারায়ণগঞ্জে। এখানে ছাত্রদের পাশাপাশি সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষ্যণীয়। যেখানে নারীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মিছিল, সভা-সমাবেশে নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়াও তারা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। নারীদের সংগঠিত করে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী

ভূমিকা পালন করেন মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, জব্বার, শহীদ হওয়ার ঘটনায় মমতাজ বেগম নারায়নগঞ্জবাসীকে ভাষার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে উজ্জীবিত করেন। ১৯৫২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জে আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। ঐদিন সকালে স্থানীয় পুলিশ নারায়ণগঞ্জ মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করে। এর প্রতিবাদস্বরূপ ছাত্রীরা ক্লাশ বর্জন করে রাজপথ অবরোধ করে। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানার শ্রমিকরা। তারা আদালত চত্ত্বরে হাজির হয়ে মমতাজ বেগমের নি:শর্ত মুক্তি দাবি করে। আন্দোলন করার দায়ে মমতাজ বেগমের সঙ্গে গ্রেফতার হওয়া তাঁরই ছাত্রী আয়েশা আক্তার খাতুন বেলু স্মৃতিচারণে বলেন,

> ২২শে ফেব্রুয়ারি মমতাজ আপার ডাকে সবাই স্কুলে একত্রিত হলাম। ঢাকার ছাত্র হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ার তোলারাম কলেজের রিকুইজিশন করা জমিতে এক বিরাট জনসভা হয়। মমতাজ বেগম এই সভায় ছাত্রছাত্রী শিক্ষক জনগণকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথে নামার আহ্বান জানান। তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমরা রাজপথে নামি। ট্রাকে চড়ে মিছিল শুরু করলাম।'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই/নুরুল আমীনের কল্লা চাই' স্লোগান দিতে দিতে শহর ঘুরলাম। ট্রাকে করে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও শ্লোগান দিচ্ছে-শহরে একদম আলোড়ন পড়ে গেল। (সাক্ষাৎকার-২০১৬, ১৩এপ্রিল)

আপোষহীন নেতৃত্বের গুনাবলির কারণে মমতাজ বেগম এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেন যে, শুধু বাংলাভাষার দাবিতে আন্দোলন করার অজুহাতে পুলিশের পক্ষে তাঁকে গ্রেফতার করা সহজ ছিল না। এজন্য স্কুলের অর্থ আত্মসাৎ করার মিথ্যা অভিযোগ এনে স্কুলের গভর্নিং বোর্ড দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করানো হয়। আসল উদ্দেশ্য ছিল নারায়নগঞ্জে ভাষা আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়া। মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার ও নারায়নগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা অনুধাবন করা যায় তৎকালীন *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার প্রতিবেদনে,

> মর্গ্যাণ গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেসের গ্রেফতারে বিক্ষোভের সৃষ্টি জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশের দুইবার লাঠিচার্জ।

৩রা মার্চ, ১৯৫২,ভারতের *দি স্টেটম্যান* পত্রিকার লেখা-

> One hundred and fifteen persons including two girls students have been arrested, so for in connection with the disturbance as narayangonj that brook out often arrest of Mrs Mamtaz Begum, headmistress of the Morgan Girls School on February 29. (বিশ্বাস, ১৯৯৫:১৪০)

জেলে মমতাজ বেগমসহ গ্রেফতারকৃতদের বন্ড সই দিতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। বলা হয়, 'তোমরা স্বেচ্ছায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করনি। তোমাদের জোর করে আনা হয়েছে'। এ বিবৃতিতে বন্ডসই দিলে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। বিবৃতি এবং বন্ডসই দিতে অস্বীকৃতি জানান অনেক ছাত্রী। মমতাজ বেগমের সংসারে ফাঁটল ধরে এ বন্ডসইকে কেন্দ্র করেই। তাঁর স্বামী অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান ছিলেন সরকারি চাকুরিজীবী। তিনি চেষ্টা করেছিলেন মমতাজ বেগম যেন সরকারের প্রস্তাব মেনে নেয়। কিন্তু মমতাজ বেগম তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। যার কারণে তার স্বামীকেও চাকরি হারাতে হয়। ১৯৫৩ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি পেলেও ১৯৫৯ সালে তাঁর দাম্পত্যজীবনের অবসান ঘটে ।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে চূড়ান্ত আন্দোলন হলেও ভাষা আন্দোলন অব্যাহত থাকে ১৯৫৬ সালে সাংবিধানিকভাবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত। এ দীর্ঘ সময় নারীরা ভাষার দাবিতে থেকেছে সোচ্চার। ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শহীদ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদিন ছাত্র-ছাত্রীরা ফেস্টুন হাতে প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করে। শুধু তাই নয় ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা 'শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ' নির্মাণ করে। যার মাঝে উল্লেখযোগ্য ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ ও কামরুন্নেছা গার্লস স্কুলে নির্মিত 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'(ইসলাম, ১৯৮২:৫৭-৫৮)। এরপর ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান 'সাহিত্য সম্মেলনে' ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচারণা ও প্রচারপত্র বিতরণ করে এবং ভাষার দাবিতে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় শোভাযাত্রাও বের করে। সেখানে ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল ব্যাপক (কবির, ২০১৪:১১০)। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস প্রত্যুষে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ছাত্র-জনতা আজিমপুরে শহীদদের কবর জিয়ারত করে। এ সময় বিভিন্ন বয়সের নারীরা কালো কাপড় পড়ে কবর জিয়ারত করতে আসেন। পরবর্তীতে আন্দোলনের তীব্রতায় ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে গৃহীত ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে ২১৪ নং অনুচ্ছেদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

খ.) রোমান ও আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ:

ভাষা আন্দোলন বাঙালি নারীদের বিভাগোত্তর কালে প্রথম প্রকাশ্য রাজপথে আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেয়। এর ফলে তারা যে সাহস সঞ্চয় করে তা তাদের পরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ গ্রহণে অনুপ্রেরণা যোগায়। আবার রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবিকে আগ্রাহ্য করার মধ্যেই শাসক গোষ্ঠীর বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন শেষ হয়ে যায়নি। তারা বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। আরবি ও রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টা এর মাঝে অন্যতম। এ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও বাঙালি নারীরা শুরু থেকেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষা বিশেষ করে বাংলা বানান, বর্ণমালা ও লিপি সংস্কারের প্রয়াস দীর্ঘ দিনের। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ কর্মচারীরা যখন ভারতে দেশী ভাষার সংস্পর্শে আসেন তখন থেকেই তাদের অনেকে ফরাসি ও উর্দু সমেত সকল ভাষায় রোমান লিপি প্রবর্তনের কথা বলতে থাকেন। ১৭৮৮ সালে স্যার উইলিয়াম জোনস প্রথম ভারতীয় ভাষা সমূহ রোমান লিপিতে লিখতে প্রবৃত্ত হন। রোমান হরফের পক্ষে যুক্তি ছিল রোমান বর্ণমালায় অক্ষর কম, তা আধুনিক জ্ঞানোন্নতির সহায়ক, মুদ্রণযন্ত্রের উপযোগী প্রমুখ (হেলাল,১৯৮৬:৬০৭-৬০৮)। এ ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ড.মোহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা ও অধ্যক্ষ নাজিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ সুফিয়ানসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষাবিদ রোমান হরফে বাংলা লেখার পক্ষে মত দিয়েছিলেন (চৌধুরী,১৯৭৬:১৬৩)। পাকিস্তান আমলে এই প্রয়াসের প্রধানত তিনটি দিক ছিল, লিপি সংস্কার, বানান সংস্কার, ভাষা সংস্কার। এর মধ্যে ভাষা আন্দোলন জোরদার হওয়ায় রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রয়াস আপাতত কিছুটা ঝিমিয়ে আসে। কিন্তু একেবারে যতি পড়েনি। কারণ ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন বয়স্কদের শিক্ষায় সংশোধিত রোমন হরফ ব্যবহারের সুপারিশ করেন (খান,১৯৬৪:১৬৩)। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান যুক্তি ছিল দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা। রোমান হরফে বাংলা প্রবর্তন প্রচেষ্টার পাশাপাশি আরবী হরফে বাংলা ভাষা লেখার প্রয়াসও একই সময়ে বিদ্যমান ছিল। এক্ষেত্রে আরবী ভাষার প্রতি বাঙালি মুসলমানের অনুরাগকে কাজে লাগনো ছিল এর উদ্যোক্তাদের প্রধান হতিয়ার। যদিও এই প্রয়াশও ইতিহাসে অনেক পুরনো। মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমান কবিদের বাংলা কাব্যের পুঁথি পড়ে আরবী হরফে অনুলিখিত হতে দেখা যায়। আরবী হরফে

লেখা এরকম বাংলা পুঁথি পাওয়া গেছে অনেক যেমন মোজাম্মলের ষোড়শ শতকের 'মক্তুল হোসেন', আলাওলের সপ্তদশ শতকের 'তোহফা' আরবী হরফে লেখা পুঁথি। এ ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে বাংলা ভাষা আরবী হরফে লেখার প্রবক্তারা নানভাবে এ প্রয়াশ চালান। পূর্ব বাংলা সরকারের শিক্ষা সচিব ফজলে আহমদ করিম ফজলী ছিলেন আরবী হরফে বাংলা প্রচলনের বিশেষ প্রবক্তা। তিনি এ কাজে বইপত্র রচনার জন্য বার্ষিক ৩৫ হাজার টাকা মুজুরী দেয়ার ব্যবস্থা করেন (উমর,২০০৩:৮৯)। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের পর এ বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা শুরু হয়। পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র জারির সময় ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে আইয়ুব খান বলেন, 'কলকাতার সাংস্কৃতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে হলে পূর্ব পাকিস্তানীদের তাদের ভাষা বদলানো দরকার'(Choudhury, 1967:813)। আইয়ুব খান যুক্তি দেখান যে, দুই অঞ্চলের সংহতি বিধানের জন্য এক ভাষা দরকার। এজন্য সমন্বয় সাধন করতে হবে। এলক্ষ্যে রোমান হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলা একাডেমীকে এই সংস্কার কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। এসময় বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে একটি কমিটিও গঠিত হয় (রহমান,১৯৮৩:৫০)। ১৯৫৯ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এক অনুষ্ঠানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষা সংস্কারের প্রতিবাদ করেন। এছাড়া 'বাংলা হরফের রদবদল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে' এই শিরোনামে বিবৃতি দেন ৪১ জন বুদ্ধিজীবী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাশিম, নারী সদস্য বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম লায়লা সামাদ, নুরজাহান বেগম প্রমুখ (*দৈনিক সংবাদ*, ০৯/০৯/১৯৬৮)। ১৯৬০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানেও বাংলা ভাষা সংস্কারের বিষয়ে সামরিক জান্তার প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করা হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নারী সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এতে অংশ গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ রোমান হরফের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে একটি প্রতিবাদলিপি ছাপা হয়'হরফ পরিবর্তন' শিরোনামে (*দৈনিক ইত্তেফাক*,১৯ও ২০ ফেব্রুয়ারি,১৯৫৯)। ১৯৬২'র ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রদের অন্যতম বক্তব্য রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ছিল। এ আন্দোলনে মাহফুজা খানম, মালেকা বেগম, রাফিয়া আক্তার ডলি ছাড়াও রাশেদা খানম রীনা, সালমা আখতার, দীপা দত্ত, শেখ হাসিনা, মমতাজ বেগম প্রমুখ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নারীরা অংশগ্রহণ করেন (সাক্ষাৎকার- মাহফুজা খানম, ২০১৯, ১লা সেপ্টেম্বর)। এছাড়া এ নীতির প্রতিবাদ করে বিভিন্ন ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। যার মাঝে অন্যতম তমদ্দুন মজলিশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, ইকবাল হল ছাত্র সংসদ, জগন্নাথ কলেজ ও ইডেন কলেজ ছাত্র সংসদ (উমর, ২০০৩:২৬০-৬৬)।

শুধুমাত্র বিবৃতি প্রদান নয় বিভিন্ন প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে ছাত্র সংসদগুলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিবেচনা বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করে। এখানে বাংলা বিভাগের ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবাদ লিপির শেষাংশে বলা হয়, আঞ্চলিক প্রভুত্ব লাভের দূরাকাঙ্খা এমনিভাবে পাকিস্তানের শত্রুতা করিতে যাইতেছে। পাক বাংলার মনে নতুন পরাধীনতার আশঙ্কা কায়েম করিয়া তুলিতেছে (উমর, ২০০৩:২৬০-৬৬)।

গ.) পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র বিরোধীতা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীঃ

শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালিদের ওপর অপর সাংস্কৃতিক অভিঘাত ছিল বাঙালি সংস্কৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়ার অপচেষ্টা। যা নিয়ে শুরু হয় পুনরায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের আর্দশের ভিত্তিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতটুকু গ্রহনীয় বা বর্জনীয় তা নিয়ে রাজনৈতিক মহল ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝে বাদ-প্রতিবাদের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশ আলোড়িত হয়ে ওঠে।

এসময় সারা বিশ্বে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ আয়োজনের প্রস্তুতি থাকলেও পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি ছিল ব্যতিক্রম। পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালন করতে নানা পরিকল্পনা নিয়ে একদল প্রতিনিধি আইয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করেন। যেখানে অন্যতম নারী প্রতিনিধি সুফিয়া কামাল এবং তিনি ছিলেন এ প্রতিনিধি দলের প্রধান। সে সময়ের কথোপকথন তিনি স্মৃতি চারণ করে বলেন,

> আইয়ুব খান আমাদের কে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা এটা কি শুরু করছেন ? জবাবে সুফিয়া কামাল বলেন, 'আমরা কি একাই শুরু করেছি। সারা বিশ্বই তো শুরু করেছে। আমরা কি পিছিয়ে থাকবো নাকি'। তখন আইয়ুব খান বলেন, 'বেগম সাহেব, এতো সব, এ বাঙালি সব গাদ্দার হ্যায়, আপ ইয়া কিয়া বলতা হে '? তখন সুফিয়া কামাল হেসে বলেন, 'আপ কিউ এ গাদ্দার আদমি ক্যা প্রেসিডেন্ট হোনা সে, ইতনা কিসার করতা হে! ছোটি যে।' এতে আইয়ুব খান ভীষণ রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেন। তবে তিনি সাহসের সঙ্গেই বসে ছিলেন। (সাক্ষাৎকার-মালেকা বেগম, ২০১৯, ১৮ মে)

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে সামরিক সরকার প্রকাশ্য বিরোধীতা না করে নানা অজুহাতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বেশ কিছু প্রখ্যাত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার শুরু করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আলাউদ্দীন আল আজাদ, কে জি.মোস্তফা, আনোয়ার জাহিদ প্রমুখ। ফলে বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন সন্ত্রস্ত। এ অবস্থায় মফস্বলের কিছু কিছু আয়োজনের খবর সংবাদপত্রে বের হতে থাকে এমনকি বগুড়া ও ফরিদপুরে শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সভাপতি হিসেবে জেলা প্রশাসকের নামও দেখা যায় (*দৈনিক আজাদ*,৬ ও ৩১ মার্চ,১৯৬১)। ঢাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করে। ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে সারা প্রদেশে সেমিনার, সাহিত্য প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠান, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, নাটক মঞ্চায়ন চলতে থাকে এবং দীর্ঘদিনের জড়তা ও নিস্তদ্ধতা কেটে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রবল প্রাণস্পন্দনের সৃষ্টি হয়। এর প্রতিবাদে ১লা বৈশাখে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে *আজাদ পত্রিকা* সবাইকে সাবধান করে লিখে, 'সোজা কথায় রবীন্দ্রনাথের দোহাই তুলিয়া অখন্ড বাংলার আড়ালে আমাদের তামুদ্দনিক জীবনের সুযোগ দেওয়া চলিবে না। একদল লোক পশ্চিম বাংলা সাহিত্যের অন্ধ অনুসারি ও ভক্ত। তাদের রবীন্দ্র ভক্তি বিপদের কারণ হইতে পারে'(রহমান,১৯৮৩:৭৯)। এছাড়াও রবীন্দ্র সাহিত্যের ব্যর্থতা, মুসলমানদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা এবং রবীন্দ্র বার্ষিকী উদযাপনকারীদের পাকিস্তান বিরোধী মানসিকতার সমালোচনা করে আরও ২৩ টি প্রবন্ধ ও চিঠি প্রকাশিত হয় *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায়। কিন্তু সরকারে ভ্রুকুটি ও বিভিন্ন প্রচারণা সফল হয়নি। ঢাকায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদাযাপনের জন্য তিনটি কমিটি গঠিত হয়-

১. ঢাকা হাইকোর্টের এস.এম মুরাদের নেতৃত্বে একটি কমিটি।
২. ঢাকার প্রেসক্লাবে তরুণ শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকদের সমন্বয়ে রবীন্দ্রজন্মশত বার্ষিকী উৎসব কমিটি ।
৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে গঠিত কমিটি।(*দৈনিক আজাদ*, ২৯মার্চ, ১৯৬১)

ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এস.এম. মুরাদের সভাপতিত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির অনুষ্ঠান হয়েছিল চারদিনব্যাপী। কবির রচনা থেকে পাঠ, নাটক মঞ্চায়ন, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও আলোচনা ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ(*দৈনিক আজাদ*, ৫ মে, ১৯৬১)। ঢাকার প্রেসক্লাবে তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি সিম্পোজিয়াম, নাটক-মঞ্চায়ন, চিত্র-পুস্তক প্রদর্শনী, শিশুদের অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন (*দৈনিক*

আজাদ, ২৯ মার্চ, ১৯৬১)। ১১ই বৈশাখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতা জাহানারা বেগম ও অমূল্য চক্রবর্তীর উদ্যোগে কার্জন হলে রবীন্দ্রজন্মশত বার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভাষণে তিনি বলেন,

> রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালির কবি ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন বিশ্বকবি। রবীন্দ্র প্রতিভা নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। তাঁর অবস্থান আমাদের আপন ভোলা মনের প্রাঙ্গণে। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলারই কবি। তার সোনার তরী পূর্ব বাংলার পদ্মা ও মেঘনাতেই বাহিত হয়েছিল আজও কবির স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে শিলাইদাহ শাহজাদপুর প্রমুখ স্থান। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩এপ্রিল, ১৯৬১)

এভাবে শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিস্টিটিউট মিলনায়তনে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয় জাঁকজমকপূর্ণভাবে। এ সম্পর্কে বেগম সুফিয়া কামাল স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে,

> এল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী। নিষেধাজ্ঞা জারী করতে তৎপর হয় অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য। অবশ্য আমার কাছে তখনকার দিনের শিল্পী সাহিত্যিক সমাজকর্মী এসে নানা রূপ পরিকল্পনায় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করার প্রতিজ্ঞা করলেন। কত যে বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে অসম সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সে আন্দোলনে। মহাসমারোহে পালিত হয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী। (কামাল, ২০০২:৫৯২-৯৩)

ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়। ময়মনসিংহে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালনে অংশ নেন সুমিতা সাহা। তিনি গান গেয়ে অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলেন। (হোসেন ও অন্যান্য, ১৯৯৮:১৫০)।

এভাবে ১৯৬১ সালে সামরিক শাসনের থমথমে পরিবেশে সমস্ত বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে রবীন্দ্রজন্মশত বার্ষিকী পালন করা হয়। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ার পর সাংস্কৃতিক কর্মীদের একাংশ সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ছায়ানট নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন। শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছায়ানট প্রতিবাদ জানায় সংস্কৃতির ভাষায়, গণমুখী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ছায়ানট। ছায়ানটের অনুষ্ঠান সম্পর্কে ওয়াহিদুল হক লিখেছেন, 'কাজ একটাই এদেশীয় বাঙালিদের সাংস্কৃতিক শূন্যতা পূরণ করা'(হক,২০০৫:২৩)। শুরুতে সঙ্গীতকে অবলম্বন করে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে শামিল হয় ছায়ানট। নিয়মিত ঋতুভিত্তিক চারটি বড় অনুষ্ঠান যেমন: শারদোৎসব, বসন্তোৎসব, পহেলা বৈশাখ ও অষ্টামঙ্গল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগঠনটি। যার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হতো বাঙালির চিরায়িত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে। বাংলা ১৩৭১ সালের ১লা বৈশাখ (১৯৬৪ খ্রি:) সন্‌জীদা খাতুনের উদ্যোগে রমনার বটমূলে সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে প্রথম বাংলা নববর্ষ পালন করে সংগঠনটি (হক,২০১১:৫১)। প্রাদেশিক সরকার এ দিনকে ছুটির দিন ঘোষণা করে। এ বছর বাংলা একাডেমী, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, ছায়ানট, তমদ্দুন মজলিশ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ সকল অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের নারী ও ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গনে ঐক্যতান গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে এত দর্শক শ্রোতা ছিল যে, ভীড়ের চাপে কয়েকজন আহত হয় (*The Pakistan Observer*, ১৫/৪/১৯৬৪)। পরবর্তী বছরগুলোতে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিটি অনুষ্ঠানে নারী সাংস্কৃতিক কর্মীদের বিশেষ অংশগ্রহণ ছিল।

ঘ.) রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নারীঃ

১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত নিয়ে বির্তক শুরু হয়। ইতিপূর্বে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় কবি হিসেবে আখ্যায়িত করে পাকিস্তান রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৬৭ সালের ২২ জুন সংসদে বাজেট অধিবেশনে রাজশাহী থেকে নির্বাচিত বিরোধীদলীয় সদস্য মজিবর রহমান চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তানী আর্দশের সঙ্গে না মিললে রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়া হবে (*দৈনিক ইত্তেফাক*,২৫/০৬/১৯৬৭)। এ সংবাদ প্রকাশের সাথে সাথে প্রদেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ পুনরায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ সালের ২৮ জুন এর প্রতিবাদে উনিশ জন প্রখ্যাত শিক্ষক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। বিবৃতি দাতাদের মাঝে নারী সদস্য হিসেবে ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, নীলিমা ইব্রাহিম। এতে আরও বলা হয়,

> স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৩শে জুন, ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সরকারি মাধ্যম হতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অনেক দু:খজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে ঐশ্বর্য দান করেছে,তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে গভীরতা ও তীক্ষ্নতা দান করেছে, যা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সংস্কৃতি সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারি নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্তার গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য। (*দৈনিক পাকিস্তান*,২৪/৬/১৯৬৭)

রবীন্দ্রসঙ্গীর প্রচার নিষিদ্ধ করে কোনো সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষিত না হওয়া সত্ত্বেও বিবৃতিটি প্রকাশের পর বাস্তবে আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সাংগঠনের সদস্যরা যুক্ত ছিলেন। মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিসেস আমেনা বেগম, ঢাকায় এগার জন উর্দু কবি, তিনটি উর্দু প্রতিষ্ঠান, খুলনার ৭০ জন বুদ্ধিজীবি প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমেনা বেগম তাঁর বিবৃতিতে বলেন, 'ক্ষমতা বলে হয়তো সাময়িকভাবে বেতার ও টেলিভিশন হইতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু গণচিত্ত হইতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুমধুর আবেদনকে কোনকালেই মুছিয়া ফেলা যাইবে না'(*দৈনিক পাকিস্তান*,২৭/৬/১৯৬৭)। সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্য সাংস্কৃতিক সংসদ, ছাত্র ইউনিয়ন, ক্রান্তি, স্পন্দন, অপূর্ব সংবাদ, ছায়ানট প্রমুখ ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সরকারী সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করে রবীন্দ্র সাহিত্য ও সঙ্গীতকে বাঙালিদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত বলে দাবি করে (রহমান,১৯৮৩:১০৭)।

সরকারিভাবে রবীন্দ্র বিরোধী প্রচার প্রচারণার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এতটাই ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে যে, টেলিভিশন শিল্পীদের টিপ দেওয়ার বিষয়টিকেও কর্তৃপক্ষ সহজভাবে নেয়নি। বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিলো যে, টেলিভিশন কতৃপক্ষ একজন মেকআপম্যানকে দায়িত্ব দিয়েছিল শিল্পীদের কপালে টিপ খোঁজা এবং কোন শিল্পী কপালে টিপ পড়লো তা খুলে নেওয়া (খাতুন, ১৯৮৯:১৯)। এছাড়া টেলিভিশনে গান গাওয়ার সময় যদি কোন ভারতীয় প্রসঙ্গ থাকতো সেটাকে বাদ দিয়েই গাইতে হতো শিল্পীদের। এ প্রসঙ্গে সান্‌জীদা খাতুন স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে,

> এমনকি আমাদের অনেক সময় গানের কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়েই গাইতে হয়েছে। যেমন- 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি' গানটির মধ্যে কিছু কিছু ভারতীয় প্রসঙ্গ থাকায় সে অংশটুকু বাদ দিয়েই গেয়েছি। (সাক্ষাৎকার- ড.সান্‌জীদা খাতুন, ১৯৯২, ২৮আগস্ট)

সরকারের এসব নীতির বিরুদ্ধে নারীরা রাজপথে নেমে প্রতিবাদ করে। মালেকা বেগম বলেন,

> সানজিদা খাতুন যখন টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে যায় ওনাকে বলেছে টিপ খুলে গান গাইতে। তিনি বলেন তাহলে আমি আর গান গাইলাম না। এই বলে তিনি গান না গেয়ে বেরিয়ে আসেন। এরপর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে আমরা পরিবাগের কাছে রাস্তায় বড় বড় লাল টিপ (কপাল জোড়া) পড়ে প্রতিবাদ জানালাম। সেখানে শ'খানেক মেয়ে ছিলো। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল বেগম সুফিয়া কামাল, আমি (মালেকা বেগম), রোকেয়া রহমান কবির, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের শাহনাজ বেগম, আঞ্জুমান আরা বেগম প্রমুখ। (সাক্ষাৎকার-মালেকা বেগম, ২০১৯, ১৮ মে)

এভাবে নারীরা কখনও রাজপথে কখনও বিবৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। মাহফুজা খনম বলেন, ঐ সময়ম রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা হতো ফলে রাজনৈতিক দাবিগুলো সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ পেত। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন বন্ধ করে দেয়। এ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। ১০০ জনের কমিটি হয়েছে। সেই কমিটিতে আমিও ছিলাম। এছাড়াও ছিল সুফিয়া কামাল, সাজেদা বেগম, মতিয়া চৌধুরী, বাসন্তী দি প্রমুখ বিভিন্ন পেশা ও বয়সের নারী। (সাক্ষাৎকার-২০১৯, ১লা সেপ্টেম্বর)।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর প্রতিবাদে ঢাকায় তিনদিন ব্যাপী কবিগুরুর উপর প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা অনুষ্ঠান করেন। এ অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেক নারী অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ নাটকটি মঞ্চস্থ হয় যেখানে নারীর ভূমিকায় অভিনয় করেন কাজী তামান্না। এছাড়া এ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন লায়লা আঞ্জুমান বানু, আফসারী খানম, ফেরদৌসী রহমান, বিলকিস নাসিরুদ্দিন, ফাহমিদা খাতুন, মালেকা আজিম খান, রওশন আরা মাসুদ, জাহানারা ইসলাম, সানজিদা খানম প্রমুখ(হোসেন ও অন্যান্য,১৯৯৮:২০৩)। বাঙালি সংস্কৃতির ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকার বাইরে খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলায় সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে নারীরা প্রতিবাদ কর্মসূচী ও বিবৃতি প্রদান করেন। সিলেটে আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ। এসময় সিলেটের সারদা হলে ঘটাকরে রবীন্দ্রজন্মশত বার্ষিকী পালন করা হয়।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের পক্ষে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দ্রুত বিস্তার ঘটলে সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে ৪ঠা জুলাই, ১৯৬৭ তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে তার বিবৃতির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, তার বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি কখনও বলেননি যে, সব রবীন্দ্রসঙ্গীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী। তিনি শুধু উর্দু কবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এটুকু বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গান যদি পাকিস্তানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিরোধী হয় তবে তা রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত হবে না (*দৈনিক আজাদ*, ৫/৭/১৯৬৭)। সরকার পক্ষের এ বিবৃতি সাংস্কৃতিক স্বাধিকারে বিশ্বাসী বাঙালিদের এক বিরাট বিজয়। এর ফলে কয়েকমাস পরেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন করা হয়। ১৯৬৭ সালে দেশের সকল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'সাংস্কৃতিক ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ' গঠন করে। এ পারিষদের উদ্যোগে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট হলে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সংস্কৃতি অনুরাগী এম.এ.বারি এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানী ড.কুদরত-ই-খুদা। নারীদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, সন্‌জীদা খাতুন প্রমুখ। এ অনুষ্ঠানে দর্শক শোতার উপস্থিতি ছিল অভূতপূর্ব (*The Pakistan Observer*, ৩/৭/৬৭)।

ভাষা আন্দোলন ও এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তী আন্দোলন গুলোতে বাঙালি নারীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ঢাকার বাইরে অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলা শহর গুলোতেও নারীদের সরব উপস্থিতি

লক্ষণীয়। প্রতিটি আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায় থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক ও পরবর্তীতে প্রকাশ্য রাজপথের আন্দোলনে নারীরা অংশগ্রহণ করেছে।

৪. অংশগ্রহণ ও কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতাঃ

তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আন্দোলন গুলোতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় নানমুখি বাধার সম্মুখিন হতে হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনেক নারীকে কারা বরণ করতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে পুলিশি নির্যাতন। এছাড়াও ছিল পারিবারিক ও সামাজিক চাপ। পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে ভাষা সংগ্রামী প্রতিভা মুৎসুদ্দি বলেন, 'পরিবার থেকে প্রচন্ড বাঁধা আসতো। আমার বাবা আমাকে অনেক মেরেছেন।বাবা বলতো আমরা মাইনরিটি, মাইনরিটিদের এসবের দরকার কি?' (কবির, ২০১৪: ১৩৮)।

ভাষা সৈনিক আলেয়া রহমান ১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সময় গ্রেপ্তার হন। তাঁর সঙ্গে সেদিন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আরও ৩৫ জন নারী। তবে অনেকে বন্ডসই দিয়ে ছাড়া পান। এতে তাদেরকে বলতে বলা হয়, 'তুমি স্বেচ্ছায় আন্দোলনে আসনি। অন্যরা তোমাকে নিয়ে এসেছে। আন্দোলনের সঙ্গে আর সম্পৃক্ত হবে না'। এরকম শর্তে বন্ড সই দিয়ে ছাড়া পান অনেকে। আলেয়া রহমানের বাবা এবং চাচা ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। তার বাবা ১০ দিনের মাথায় তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। তাঁর বাবা এতই রেগে গিয়েছিলেন যে জেলেই তাঁকে চড় থাপ্পর মারেন। এরপর নাকে খত দিয়ে তাকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে হয়। প্রায় ১ মাসের মত লেখাপড়া বন্ধ করে দেন তার বাবা। এরপর আর আন্দোলনে যাবেনা বলে লিখিত দিয়ে মায়ের সহযোগিতায় পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন (সাক্ষাৎকার-আলেয়া রহমান,২০১৭, ১৫জানুয়ারি)। সিলেটের সালেহা বেগমকে ভাষা আন্দোলনের সময় ময়মনসিংহ স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলনের জন্য সেখানকার ডিসি মিস্টার ডি.কে পাওয়ার এর আদেশক্রমে ৩ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। পরবর্তীতে আর পড়াই হয় নি তার।

পাকিস্তান শাসনামলে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয় ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ কে । ফলে বাঙালি সংস্কৃতিকে শাসক গোষ্ঠী আখ্যায়িত করে ইসলাম বিরোধী হিন্দু সংস্কৃতি হিসেবে। এর চর্চাকে একরকম ভীতির চোখে দেখা হয় এবং তা বন্ধে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে সন্‌জিদা খাতুন বলেন,

> আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি (তিনি ১৯৫২ সালে বাংলায় ভর্তি হয়েছিলেন)। আমরা সকালে মঞ্চে মহড়া করছি, সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় অনুষ্ঠান। কেউ একজন উপাচার্যের কাছে নালিশ করেছে যে, আমরা নাকি ঘন্টা বাজিয়ে পূজা করছি। পাকিস্তান আমলে কে কোথায় পূজা করল, কোথায় হিন্দুয়ানি কথা-বার্তা বলল, এই নিয়েই ছিল তাদের যত সমস্যা। সেই সময়ে উপাচার্য এই খবর পেয়ে একেবারে রেগেমেগে ঢুকলেন কার্জন হলে, তখন আমরা তাকে এই বুঝিয়ে ক্ষান্ত করি যে, এরকম কোন ব্যাপার এখানে হয় নি। (সাক্ষাৎকার-২০১৬, ২১ মে)

পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় বাধার কারনে অনেক সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারী কর্মীদের উপস্থিতি কমে যায়। পরিস্থিতি এমন চরম পর্যায়ে পৌছায় যে শিল্পীর অভাবে মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান আয়োজন করাই কষ্টসাধ্য হয়ে যেতো। ছায়ানট প্রসঙ্গে ওয়াহিদুল হক বলেন, 'বর্ষা গিয়ে শীত নামে, তেমন কিছু অনুষ্ঠানও দাঁড়াচ্ছে না। আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠান করতে প্রয়োজন শিল্পী। কিন্তু এর কোনো ব্যবস্থা নেই '(হক, ২০১১:৫১)।

ষাটের দশকে এসে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা বৃদ্ধি পায়। এ সময় নারীর প্রতি রক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তন আসে। আবার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ওপর নানা নিষেধাজ্ঞা থাকায় সাংস্কৃতিক কর্মীরাই তাদের ভূমিকা পালন করে। ফলে তাদেরও নানামুখি নিপিড়নের শিকার হতে হয়। এসব বাধা বিপত্তির পরও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বাঙালি নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলতে পারি, বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিপূরক হিসেবে থেকেছে। যার প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। দেশভাগপূর্ব লেখনি প্রচেষ্টা থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের এ অংশগ্রহণ আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং আন্দোলন কে দ্রুত সাফল্যের দিকে নিয়ে গিয়েছে। তবে নারীদের এ অংশগ্রহণ সংখ্যার দিক থেকে বিচার না করে কার্যক্রমের বহুমাত্রিকতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করলে যথার্থ হবে। কারন শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের যে অপচেষ্টা এর বিরুদ্ধে শুদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে তা রুখে দেওয়ার এ আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে প্রগতির পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যা স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করে।

গ্রন্থপঞ্জি

আব্দুল্লাহ, তুষার (সম্পাঃ) (১৯৯৭). *বাহান্নর ভাষা কন্যা*, ঢাকাঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা।

আহাদ, অলি (২০০৪). *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি।

ইসলাম, রফিকুল (১৯৮২). *ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার*, ঢাকা।

উমর, বদরুদ্দীন (২০০৩). *সংস্কৃতির সংকট*, ঢাকাঃ শ্রাবণ প্রকাশনী।

...... (১৯৯৫), *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম ও ৩য় খণ্ড)*, ঢাকা:জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

কামাল, সাজেদা (সম্পাঃ) (২০০২). *সুফিয়া কামাল রচনা সমগ্র*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি।

কবির, মোহাম্মদ হুমায়ুন (২০১৪). *ভাষা আন্দোলন ও নারী*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি।

খান, বাশার (সম্পাঃ) (২০১৮). *সংগ্রামী নারী ৫২ ও ৭১*, Daily Star Books

খান, ফেরদৌস (১৯৬৪). *হরফ সমস্যা*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১(৩)।

খাতুন, সানজীদা (১৯৮৯). *ছায়ানটঃ সবারে করিব আহ্বান*, স্মরণিক-৮।

চৌধুরী, মুনীর (১৯৭৬). *বাংলা গদ্যরীতি*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

বেগম, মালেকা (সম্পাঃ) (২০০৬). *নির্বাচিত বেগমঃ অর্ধশতাব্দীর সমাজ চিত্র (১৯৪৭-২০০০)*, ঢাকাঃ পাঠক সমাবেশ।

বিশ্বাস, ড. সুকুমার (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) (১৯৯৫). *বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন কলকাতার সংবাদপত্র*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি।

মতিন, আবদুল ও রফিক, আহমদ (১৯৯১). *ভাষা আন্দোলন-ইতিহাস ও তাৎপর্য*, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ।

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২). *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা: UPL।

রহমান, সঈদ-উর (১৯৮৩). *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী।

...... (২০০১). *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২)*, ঢাকাঃ অনন্যা প্রকাশ।

সালাম, ড. শেখ আবদুস (সম্পাঃ) (২০১৮). *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি ও শিক্ষা সহায়ক কর্মকান্ড: সেকাল-একাল*, CARASS: ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়।

সালাহউদ্দিন, ড. খালেদা (২০০৬). *একুশ শতকে বাংলাদেশের নারী*, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স।

সিদ্দিকী, ড. রেজোয়ান (১৯৯৬). *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আন্দোলন (১৯৪৭-৭১)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হক, আবুল কাশেম ফজলুল (২০০২). *সংস্কৃতির সহজ কথা*, ঢাকা: অ্যার্ডন পাবলিকেশন।

হক, আব্দুল (১৯৯৮). সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিত, হোসেন, সেলিনা ও অন্যান্য (সম্পাঃ), *একুশের স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হক, ওয়াহিদুল (২০০৫). *সংস্কৃতি জাগরণের প্রথম পর্ব*, ঢাকা।

.... (২০১১). ছায়ানটঃ আরম্ভ কথা, হাসনাত, আবুল (সম্পাঃ), *ছায়ানটঃ স্থির প্রত্যয়ে যাত্রা*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী।

হেলাল, বশীর আল (১৯৮৬). *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হোসেন, সেলিনা ও অন্যান্য (সম্পাঃ) (১৯৯৮). *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

Choudhury, G. W (1967). *Documents and speeches on constitution of pakistan*, Dhaka: Green Book house.

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

উমর, বদরুদ্দিন (১৯৮২). পঞ্চাশের দশকের শুরুতে শিক্ষা ও শিক্ষক, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঈদসংখ্যা।

খান, বাশার (২০১৬). ভাষা আন্দোলনে উপেক্ষিত নারী সংগ্রামী, *দৈনিক সমকাল*, ১৮ ফেব্রুয়ারি।

সাক্ষাৎকার

- মাহফুজা খানম (২০১৯, ১লা সেপ্টেম্বর) নিজ বাসভবন, ঢাকা। (মাহফুজা খানম ১৯৬৬-৬৮ সময়কালে ডাকসুর নির্বাচিত প্রথম নারী ভিপি ছিলেন।)
- শর্মিলি আহমেদ (২০২২, ১লা জানুয়ারি) Available at:desh tv YouTube channel (accessed 2March 2022)। (শর্মিলি আহমেদ (৮মে ১৯৪৭-৮জুলাই ২০২২) ছিলেন একজন বাংলাদেশী টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র অভিনেত্রী।)
- রামেন্দ্র মজুমদার (২০১৯,৫জুলাই) নিজ বাসভবন, ঢাকা। (রামেন্দ্র মজুমদার একজন খ্যাতিমান মঞ্চনির্দেশক, নির্মাতা এবং ঢাকার মঞ্চনাটক আন্দোলনের পথিকৃৎ।)
- প্রফেসর ড. শরিফা খাতুন (২০১৪, ২৫মার্চ) (ভাষা সৈনিক), উদ্ধৃত-খান, বাশার (সম্পাঃ) (২০১৮). *সংগ্রামী নারী ৫২ ও ৭১*, Daily Star Books
- মাহবুবুল আলম চৌধুরী (২০০৫, ২৫মে) উদ্ধৃত-কবির, মোহাম্মদ হুমায়ুন (২০১৪). *ভাষা আন্দোলনে নারী*, ঢাকা:বাংলা একাডেমি।
- গোলাম আরিফ টিপু (২০০৫, ১২ সেপ্টেম্বর) উদ্ধৃত-কবির, মোহাম্মদ হুমায়ুন (২০১৪). *ভাষাআন্দোলনে নারী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
- আয়েশা আক্তার খাতুন বেলু (২০১৬, ১৩ এপ্রিল), (ভাষা সৈনিক), উদ্ধৃত-(খান, ২০১৮)।

- মালেকা বেগম (২০১৯, ১৮মে) নিজ বাসভবন, ঢাকা (নারী আন্দোলনের একজন প্রখ্যাত নেত্রী ও নারী অধিকার কর্মী। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।)
- ড. সান্‌জীদা খাতুন (১৯৯২, ২৮আগস্ট) *সপ্তাহিক বিচিত্রা*। (বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী, লেখক, গবেষক, সংগঠক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।)
- ড. সান্‌জীদা খাতুন (২০১৬, ২১মে) উদ্ধৃত-সালাম, ড.শেখআবদুস(সম্পাঃ) (২০১৮). *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি ও শিক্ষা সহায়ক কর্মকান্ড: সেকাল-একাল*, CARASS: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- আলেয়া রহমান (২০১৭, ১৫জানুয়ারি), (ভাষা সৈনিক), উদ্ধৃত-(খান, ২০১৮)।

[**Abstract:** Bengali women had a significant participation in the cultural movement leading to the development of Bengali nationalism in East Bengal. This cultural movement is an important chapter of Bengali freedom movement. Through the language movement, the basic formula of East Bengal's cultural self-identity continued to evolve. Later as the political movement became stronger, the cultural movement went along with it. At this time, apart from direct movement on the streets, the popular media of art and culture like music, drama, poetry, dance and film were became the main weapons of protest. As a result, opportunities are created for women to participate in the cultural movement through multi-dimensional activities. Through this participation, on the one hand, women get the opportunities to conduct cultural activities and on the other hand, political awareness increases among them. In the decade of fifty and sixty, when Bengali women were kept at home and encouraged to perform traditional family duties through various religious and social customs, this brave participation of women deserves special praise.]